গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১১ সংখ্যা | ৩ - ৯ নভেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

আমৃত্যু বিপ্লবী এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পলিটবুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জীর জীবনাবসান

১৬ অক্টোবর রাতে জীবনাবসান ঘটল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড মানিক মুখার্জীর।

ওই দিন সন্ধ্যায় তিনি দলের টালা সেন্টারে অসুস্থ হয়ে পড়লে দলের চিকিৎসক কর্মীরা দ্রুত পৌঁছে চিকিৎসা শুরু করেন এবং তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর প্রাণ রক্ষা করা যায়নি। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্রই দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা দলের নেতা, কর্মী, সমর্থক, দরদিদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। সমাজমাধ্যমে তাঁরা গভীর শোক প্রকাশ করেন। বহু বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীও শোক জ্ঞাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যের নেতা কর্মীরা যাতে তাঁর শেষযাত্রায়

দুয়ের পাতায় দেখুন

মোটরভ্যান চালকদের পরিবহণ দপ্তর অভিযান

মোটরভ্যান ও টোটো চলাচলে পুলিশি হয়রানি বন্ধ এবং লাইসেন্স ও পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতির দাবিতে ১০ অক্টোবর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত মোটরভ্যান ও টোটো চালকদের দুটি ইউনিয়নের নেতৃত্বে হাজার হাজার মোটরভ্যান ও টোটো চালক কলকাতা পরিবহণ দপ্তর অভিযান করেন। উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস

ফাঁসিদেওয়ায় পিএমপিএআই-এর ডেপুটেশন

৯ অক্টোবর দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকরা পিএমপিএআই-এর উদ্যোগে ফাঁসিদেওয়া রুরাল হসপিটালের বিএমওএইচ-এর কাছে হাসপাতালের পরিকাঠামোর ঘাটতি পূরণ, ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং প্র্যাক্টিশনারদের নাম নথিভুক্ত করা ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দেন। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের কনভেনর বিপ্লব দেবনাথ, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের যুগ্ম আহ্বায়ক বাবুলাল বৈঠা ও আনিসুল হক সহ চল্লিশ জনের বেশি উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে খড়িবাড়ি ব্লকের সম্পাদক অরুণ কুমার সিংহ এবং কয়েকজন সদস্য সামিল হয়েছিলেন।

কমরেড মানিক মুখার্জীর জীবনাবসান

একের পাতার পর

উপস্থিত হতে পারেন সেজন্য তাঁর দেহ হাসপাতালের মরচুয়ারিতে রাখা হয়।

১৮ অক্টোবর কমরেড মানিক মুখার্জীর দীর্ঘদিনের কর্মস্থল কলকাতায় ৪৮ লেনিন সরণিতে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকায় মোড়া তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। শত শত মানুষ সমবেত হন প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে।

প্রথমেই মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের সাধারণ সম্পাদক এবং প্রয়াত কমরেড মানিক মুখার্জীর দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা কমরেড প্রভাস ঘোষ। একে একে পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও উপস্থিত পলিটবুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা মাল্যদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের পার্টি নেতৃবৃন্দও মাল্যদান করেন। বিভিন্ন ফ্রন্ট, ফোরামের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠনের নেতারা শ্রদ্ধা জানান। সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি ও সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের নেতারাও শ্রদ্ধা জানান। শত শত মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশন করে দলের সঙ্গীত গোষ্ঠী। সমবেত কমরেডদের 'লাল সেলাম' ধ্বনির মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রয়াত নেতার শেষযাত্রা।

তাঁর বিপ্লবী জীবনের ৮৯ বছরের প্রতীক হিসাবে রক্তপতাকা হাতে ৮৯ স্বেচ্ছাসেবক সারিবদ্ধভাবে মরদেহবাহী গাড়ির পাশে দাঁড়ান। নেতৃবৃন্দের সারির পিছনে কমরেডরা গভীর আবেগে আন্তর্জাতিক গানে গলা মিলিয়ে শেষযাত্রায় অংশ নেন। কেওড়াতলা শ্মশানে প্রয়াত নেতার মরদেহের সামনে লাল সেলাম জানান কমরেড প্রভাস ঘোষ, অসিত ভট্টাচার্য সহ নেতৃবৃন্দ ও কয়েকশো কর্মী সমর্থক। গভীর আবেগে কমরেডদের লাল সেলাম ধ্বনির মধ্য দিয়ে সকলে বিদায় জানান প্রয়াত নেতাকে।

২৬ অক্টোবর কলকাতার মহাজাতি সদনে কমরেড মানিক মুখার্জীর স্মরণসভায় হলের সামনে রাখা প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান অসংখ্য মানুষ। হল উপচে যাওয়ায় শত শত মানুষ বাইরে লাগানো মাইকে বক্তব্য শোনেন। মঞ্চে রাখা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। কমসোমল বাহিনীর গার্ড অফ অনার এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর সভার সভাপতি কমরেড অসিত ভট্টাচার্য পাঠ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য। বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শোকবার্তা পাঠ করা হয়।

এরপর কমরেড মানিক মুখার্জীর দীর্ঘ বিপ্লবী জীবনের বিষয়ে আলোচনা করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীতে গলা মেলান হলের সকলে।

এস কে এম-এর রাজ্য কনভেনশন

১২ অক্টোবর কলকাতায় মৌলালি যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এস কে এম)-এর রাজ্য কনভেনশন। কনভেনশনে এআইকেকেএমএস সহ মোট ১৬টি কৃষক সংগঠন উপস্থিতি ছিল। বক্তব্য রাখেন এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক ও এসকেএম-এর সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেটর কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, এসকেএম ভারতে আজ কৃষক আন্দোলনের একটি নাম।

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষাকারী তিনটি কালা কৃষি আইন পাশ করেছিল, কৃষকরা মরণপণ লড়াই করে মোদি সরকারকে তা বাতিল করতে বাধ্য করেছিল। তিনি বলেন, শুধু বিজেপি সরকার নয়, রাজ্য বা কেন্দ্রের কোনও সরকার কৃষক বিরোধী নীতি গ্রহণ করলে, তার বিরুদ্ধে এসকেএম তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবে। ফসলের এমএসপি, প্রিপেড স্মার্ট মিটার বাতিল, গ্রামীণ মজুরের সারা বছরের কাজ সহ অন্যান্য দাবিতে ২৬-২৮ নভেম্বর রাজ্যগুলির রাজ্যপাল ভবনের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান ও ঘেরাও চলবে। রাজ্য এআইকেকেএমএস এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। কনভেনশন উদ্বোধন করেন সর্বভারতীয় এসকেএম নেতা হান্নান মোল্লা। সমস্ত কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এসকেএম-এর রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

শিক্ষার দাবিতে ওড়িশা বিধানসভা অভিযান

বন্ধ থাকা সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলি খোলা, স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল সহ নানা দাবিতে এ আই ডি এস ও ওড়িশা রাজ্য কমিটি ১৭ অক্টোবর বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। রাজ্য সভাপতি কমরেড সোমনাথ বেহেরার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করেন।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে দিল্লিতে ছাত্রবিক্ষোভ

জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর এআইডিএসও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া সহ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন কমরেড শ্রেয়া, কমরেড প্রশান্ত কুমার, জেএনইউ-এর গবেষক কমরেড সুমন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হোসিয়ারি শ্রমিকরা ১০.৩৩ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি আদায় করলেন

তমলুকের ডেপুটি লেবার কমিশনারকে ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সভা অতি সত্বর ডেকে বোনাস সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছিল। ১৩ অক্টোবর কলকাতায় নবমহাকরণে হোসিয়ারি শিল্পের সাথে যুক্ত ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ও মেকার মালিক এবং শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভায় ১০.৩৩ শতাংশ হারে শ্রমিকদের বোনাসের দাবি আদায় হয়। নবমহাকরণের সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা ও জেলা যুগ্ম সম্পাদক নেপাল বাগ।

সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়াল দাঁত-নখে ছিন্নভিন্ন প্যালেস্টাইন

গত তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেস্টাইনের গাজায় ভয়ঙ্কর হামলা চালাচ্ছে উগ্র ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েল। মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ছে গাজার মাটিতে। বিধ্বংসী বোমায় মানুষজন নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি। গাজা রক্তাক্ত বিধ্বস্ত। এ পর্যন্ত মারা গেছেন গাজার প্রায় ৮ হাজার মানুষ, যার মধ্যে তিন হাজারের বেশি শিশু। লক্ষ লক্ষ সন্ত্রস্ত মানুষ এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন দক্ষিণের দিকে। রেহাই মিলছে না অসুস্থদেরও। গাজার হাসপাতালে পর্যন্ত বেপরোয়া হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলের হিংস্র বাহিনী, অসহায়ের মতো মরতে হয়েছে শয়ে শয়ে রোগীকে। ইজরায়েলের যুদ্ধবিমান অ্যাম্বুলেন্স লক্ষ্য করেও বোমা ছুঁড়েছে। অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে গাজাকে। খাদ্য, জ্বালানি, পানীয় জলের অভাবে হাহাকার করছেন গাজার মানুষ। বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহু হাসপাতাল।

পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্র থেকে প্যালেস্টাইনকে যেন মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু বলেছেন, এ তো সবে শুরু— গোটা মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা আমরা বদলে দেবো। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্যালেস্টিনীয়দের প্রতি ঘৃণা উগরে দিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'ওরা পশুমানুষ— আমরা সেই মতোই আচরণ করছি।'

প্যালেস্টিনীয়দের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের কেন এই ঘৃণা? কী তাদের অপরাধ? আন্তর্জাতিক সমস্ত সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, রাষ্ট্রসংঘের 'দুই রাষ্ট্র সমাধান'-এর চুক্তি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা না করে গোটা প্যালেস্টাইনকেই নিজেদের দখলে আনতে চূড়ান্ত বর্বরতায় বছরের পর বছর ধরে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলের শাসকরা। প্যালেস্টাইনে শত শত বছরের বাসিন্দা লক্ষ লক্ষ আরব-মুসলমানকে জন্মভূমি থেকে উৎখাত করে উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করতে বাধ্য করছে। এর বিরোধিতা করছেন প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দা আরবরা। এই কি তাঁদের অপরাধ? আন্তর্জাতিক ভাবেও স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকৃত। তাহলে কোন যুক্তিতে গাজায় এই পৈশাচিক হানাদারি চালাচ্ছে ইজরায়েল?

এই বর্বরতায় ইজরায়েলকে সম্পূর্ণ মদত দিয়ে চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার লুঠের স্যাঙাৎ ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়ানো কয়েকটি আরব দেশ এবং গোটা বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী মানুষের আপত্তি অগ্রাহ্য করে এই অসম যুদ্ধে যুদ্ধবিমান সহ অস্ত্রশস্ত্র জোগান দেওয়ার পাশাপাশি নানা ভাবে ইজরায়েলকে মদত জোগাচ্ছে আমেরিকার পাশাপাশি ব্রিটেনও। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থনের দীর্ঘ ভারতীয় ঐতিহ্য দু-পায়ে মাড়িয়ে ইজরায়েলের ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছেন।

এই সংঘর্ষের দায় কার

বছরের পর বছর ধরে ইজরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত হতে হতে গত ৭ অক্টোবর আচমকা ইজরায়েলে হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস। একেই অজুহাত করে নতুন করে গাজায় নির্মম আক্রমণ শুরু করে ইজরায়েল যা ভয়াবহ গণহত্যার রূপ নিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য যাঁরা হামাসকে দায়ী করছেন, তাদের প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল সংঘর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে একবার চোখ রাখতে হবে।

প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল সংঘর্ষের ইতিহাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন। সেখানে মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হওয়ার পর এই ভূখণ্ড মিত্রশক্তির হাতে চলে যায়। 'প্যালেস্টাইন ম্যানডেট'-এর মাধ্যমে এর শাসনভার দেওয়া হয় ব্রিটেনকে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রিটেন এখানকার বাসিন্দা বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে তোলে। উগ্র ইহুদিবাদে উস্কানি দিয়ে তারা বাইরে থেকে বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ ও বসবাসের অধিকার দেয়। ফলে এই ভূখণ্ডে ক্রমে বাড়তে থাকে ইহুদিদের সংখ্যা। তারা এখানকার আদি অধিবাসী আরবদের উৎখাত করে একটু একটু করে প্যালেস্টাইনের দখল নিতে থাকে।

ইতিমধ্যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের নাৎসি বাহিনী প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। এই যুদ্ধে হিটলার পরাজিত হওয়ার পর বিশ্ব জুড়ে ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতির হাওয়া ওঠে। সেই হাওয়া পালে লাগিয়ে উগ্র ইহুদিবাদীরা প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে তাদের 'নিজস্ব বাসভূমি'র দাবি জোরালো ভাবে তুলতে থাকে। তৈরি হয় বিরোধের একটা পরিবেশ। এই সময়ে ব্রিটেন এখানকার শাসনভার রাষ্ট্রসংঘের হাতে তুলে দেয়।

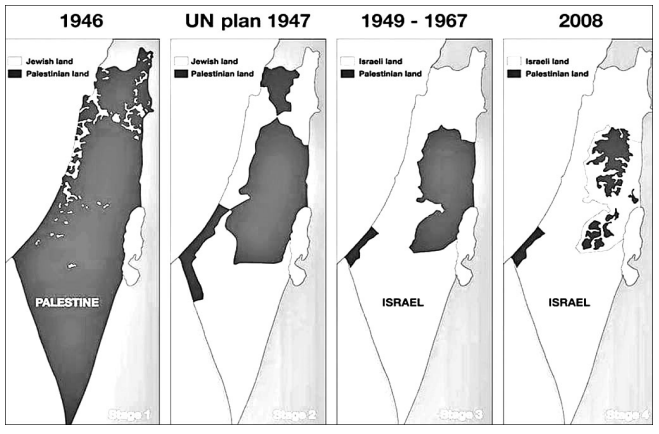

এভাবেই গোটা প্যালেস্টাইনে দখলদারি বাড়িয়ে চলেছে ইজরায়েল

রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্ত করে, প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড দু'ভাগে ভাগ করে ইহুদিদের জন্য ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও সেখানে অন্য ধর্মের মানুষেরও থাকার অধিকার থাকবে। সেই অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ১৪ মে প্রতিষ্ঠিত হয় ইজরায়েল রাষ্ট্র। শুরু থেকেই উগ্র ইহুদিবাদীরা ছলে বলে কৌশলে, এমনকি নিজস্ব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়েও এই অঞ্চলে নিজেদের সংখ্যা ও আধিপত্য বাড়াতে থাকে। শত শত বছর ধরে প্যালেস্টাইনে বসবাসরত আরব-মুসলমানদের উচ্ছেদ করে গায়ের জোরে বিপুল পরিমাণ জমি নিজেদের দখলে আনতে থাকে। লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টিনীয় নিজেদের ঘরবাড়ি, জমি-জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রতিবেশী জর্ডন, লেবানন, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশগুলির উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আজও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেখানে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন ছিন্নমূল অসংখ্য প্যালেস্টিনীয়। এভাবেই প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল বিরোধের সূত্রপাত।

গড়ে উঠল প্রতিরোধ আন্দোলন

জন্মভূমি ফিরে পাওয়ার দাবিতে অচিরেই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন সেখানকার আদি বাসিন্দা প্যালেস্টিনীয়-আরবরা। গোটা আরব দুনিয়া তাদের পাশে দাঁড়াল। অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যে নিজের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য তথা খনিজ তেলের বিপুল সম্পদের ওপর দখল কায়েম করার প্রয়োজনে নিজের একটি ঘাঁটি বানানোর উদ্দেশ্যে ইজরায়েলকে বেছে নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ সহ সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগল তাকে। এই অবস্থায় প্যালেস্টাইনের পক্ষ নিয়ে মিশর ও সিরিয়া বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চালায় মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের সঙ্গে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে সিরিয়া

সাতের পাতায় দেখুন

প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর আক্রমণ বন্ধ করো
দেশজুড়ে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ অক্টোবর এক বিবৃতিতে প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলের আক্রমণ বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, গাজা ভূখণ্ডে যুদ্ধ বন্ধ করার দাবিতে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে আমেরিকা সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে জায়নবাদী ইজরায়েল আক্রমণ চালিয়ে শত শত শিশু, নারী, যুবক এবং প্রবীণ মানুষদের প্রতিদিনই হত্যা করে চলেছে, তাদের বাড়িঘর, সম্পত্তি, হাসপাতাল ধ্বংস করছে, খাদ্য-জল-বিদ্যুৎ-ওষুধপত্র সরবরাহে অবরোধ তৈরি করে যে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে তা ফ্যাসিস্ট হিটলারের গণহত্যার জমানাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবে ভারত সরকার ভোট দানে বিরত থাকে, যা এ দেশের জনগণের স্বাধীনতার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

এই ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে ভারত সরকারের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কত বিপজ্জনক। ভারত সরকার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে গভীর জোটবদ্ধতাও এই ঘটনা প্রমাণ করে দেয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারত সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে এবং ইজরায়েলের গাজায় মারণ হামলা বন্ধ করার দাবিতে আমরা দেশবাসীকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর আক্রমণ বন্ধ করো— এই দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ১ নভেম্বর দেশব্যাপী ধিক্কার দিবস পালন ও বিক্ষোভের ডাক দিচ্ছে।

কলকাতা

দিল্লি

ওড়িশা

কমরেড মানিক মুখার্জীর প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য

কেন্দ্রীয় অফিসে কমরেড মানিক মুখার্জীর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য, আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড মানিক মুখার্জীর মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সহযোদ্ধা ও আমাদের দলের পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর মাধ্যমে কমরেড মানিক মুখার্জী দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৪০-এর দশকে কমরেড নীহার মুখার্জীর যৌথ পরিবার ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসে। কমরেড মানিক মুখার্জীও তাঁদের সাথে কলকাতায় চলে আসেন।

কমরেড মানিক মুখার্জী তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দলের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কমসোমল গড়ে ওঠার সময় কমরেড মানিক মুখার্জীকে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি দক্ষতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছুদিন পর ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা এস ইউ সি-এসবি (স্টুডেন্টস বুরো)-তে কাজ শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি দু'বার টিবি এবং জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ায় দীর্ঘদিন দলের কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারেননি।

১৯৬৩ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ বুদ্ধিজীবীদের যুক্ত করে দলের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কমরেড মানিক মুখার্জীকে দায়িত্ব দেন। শুরুতে তিনি দুজন কমরেডকে সঙ্গে নিয়ে 'পথিকৃৎ' নামে বাংলায় একটি সাংস্কৃতিক দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। পরে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর একটি নাটকের গ্রুপ ও সঙ্গীত গোষ্ঠী তৈরি করে পথিকৃৎ সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তোলা হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও পথনির্দেশকে ভিত্তি করে শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে তিনি গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে বাড়তে থাকা কিছু পশ্চাদগামী ভাবধারা, যেগুলি প্রগতিশীলতার মোড়কে উপস্থিত করা হচ্ছিল, সেগুলির অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি শীঘ্রই সংস্কৃতি জগতে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

১৯৭৫-৭৬ সালে এস ইউ সি আই (সি) মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে শিল্প-সাহিত্য জগতের বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের যুক্ত করে একটি পাবলিক কমিটি গঠনের জন্য কমরেড মানিক মুখার্জীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সাফল্যের সাথে সেই কমিটি গড়ে তোলেন এবং সর্বসম্মতিতে সেই কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ পথিকৃৎ আয়োজিত শরৎ জন্মবার্ষিকীর বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখেন। সেই ভাষণগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংকলিত করে 'শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে' নামে একটি পুস্তিকা শরৎ জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই কমিটির তত্ত্বাবধানে 'গোল্ডেন বুক অফ শরৎচন্দ্র' নামে বহুভাষিক একটি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রধান সম্পাদক হিসাবে কমরেড মানিক মুখার্জী অত্যন্ত দক্ষ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে কমরেড মানিক মুখার্জী হিন্দি ও অন্যান্য ভাষার অগ্রগণ্য সাহিত্যিকদের যুক্ত করে 'অল ইন্ডিয়া শরৎ সেন্টিনারি কমিটি' গড়ে তোলেন। কমরেড মানিক মুখার্জী 'প্রেমচন্দ শতবার্ষিকী কমিটির'-ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবর্ষে কমরেড মানিক মুখার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'গোল্ডেন বুক অফ বিদ্যাসাগর'।

স্মরণসভার মঞ্চে প্রয়াত কমরেডের প্রতি বিপ্লবী শ্রদ্ধা কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের

স্মরণসভার একাংশ

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮০-র দশকের শুরুতে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দেয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার হরণ করে। এ রাজ্যের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ভাষাশিক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। 'শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি' নামে একটি গণকমিটি গড়ে ওঠে যার মুখ্য সংগঠক ছিলেন কমরেড মানিক মুখার্জী। এই কমিটির নেতৃত্বে দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে আন্দোলন চলে এবং সিপিএম সরকার প্রাথমিকে ইংরেজি পুনরায় চালু করতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাস্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে গড়ে ওঠে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি।

কমরেড মানিক মুখার্জীর শেষযাত্রা

১৯৯০ সালে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দুঃখজনক পতনের পর কমরেড নীহার মুখার্জীর পরিচালনায় দল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের যুক্ত করে যুদ্ধবিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কমরেড মানিক মুখার্জীকে সেজন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যোগাযোগ গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টার ফল হিসাবে ১৯৯৫ সালে কলকাতায় একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, জাইরে, তুরস্ক, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল সহ বহু দেশের এবং ভারতের নানা রাজ্যের প্রতিনিধিরা সেই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। এরপরে ১৯৯৭, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭ সালে আরও চারটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কনভেনশন থেকে আমেরিকার প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ককে সভাপতি ও কমরেড মানিক মুখার্জীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট কোঅর্ডিনেটিং কমিটি গঠিত হয়। কমরেড মানিক মুখার্জী অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দল এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যান। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে মূল্যবান বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। বিশ্বের যে দেশেই তিনি গেছেন, সর্বত্রই তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা সে দেশের বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে নানা পেশার মানুষের উপর ছাপ ফেলেছেন।

১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসে কমরেড মানিক মুখার্জী স্টাফ মেম্বারশিপ লাভ করেন এবং দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার আগেই তিনি দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি দলের বাংলা মুখপত্র গণদাবীর সম্পাদকও ছিলেন।

কমরেড মুখার্জী ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত দলের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটবুরো ও সেন্ট্রাল এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে দলের তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটবুরোর সদস্য হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন। আমৃত্যু তিনি তাঁর এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

কমরেড মানিক মুখার্জী ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ। শোষিত নিপীড়িত মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার নিরন্তর চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে অত্যন্ত উচ্চমানের এক বিপ্লবী নেতা হিসাবে গড়ে তুলতে এবং পার্টির সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের হৃদয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে, কমরেড মানিক মুখার্জী তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করেছিলেন, দল ও শোষিত জনগণের স্বার্থে তিনি দায়িত্ব পালন করে গেছেন, এমনকি পার্কিনসন রোগ যখন তাঁর চলাফেরার গতি ক্রমশ রুদ্ধ করেছে, তখনও তাঁর চিন্তার শক্তিকে খর্ব করতে পারেনি। তাঁর মৃত্যু দেশের শোষিত জনগণের কাছে গভীর ক্ষতি। তাঁর এই বিপ্লবী সংগ্রাম এবং কর্মনিষ্ঠা দেশের মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত সকল মানুষের কাছেই প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

কমরেড মানিক মুখার্জী লাল সেলাম

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ পরবর্তীতে প্রকাশিত হবে

কামদুনি ঃ দোষীদের লঘু শাস্তির প্রতিবাদে কলকাতায় সভা

কামদুনির পৈশাচিক ঘটনার সাথে যুক্ত অপরাধীদের সাজা লঘু করার বিরুদ্ধে ১৩ অক্টোবর কলেজ স্ট্রিটের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজন করে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি, মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এবং বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি। সভায় সিপিডিআরএস-এর পক্ষে অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বরুণ বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষে জ্ঞানতোষ প্রামাণিক এবং নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষে মানসী রায় এবং বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন।

বিরলের মধ্যে বিরলতম এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের সাজা যেভাবে প্রমাণের অভাবে, পুলিশ এবং সিআইডি-র অপদার্থতায় হাইকোর্টে লঘু হয়ে গেল তা অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে সকলে অভিহিত করেন। সভায় এই জঘন্য অপরাধীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মদ নিষিদ্ধ করা এবং নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

ডায়মন্ডহারবারে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন মিড ডে মিল কর্মীদের

১৩ অক্টোবর সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মিড ডে মিল কর্মীদের সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং ৬৩০০ টাকা বেতনের দাবিতে ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে প্রায় পাঁচ শতাধিক মিড ডে মিল কর্মী উপস্থিত ছিলেন। পরে ডায়মন্ডহারবার শহরে মিছিল করা হয়। রান্না করা, পরিবেশন করা, বাসন ধোওয়া সহ সকল কাজ করতে হয় মিড ডে মিল কর্মীদের। এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এই রাজ্যে তাঁরা মাসে বেতন পান মাত্র ১৫০০ টাকা। আবার এই টাকা বছরের ১০ মাস দেওয়া হয়, মে মাসের গ্রীষ্মকালীন ও অক্টোবর মাসের পূজার ছুটির অজুহাতে ২ মাস বেতন দেওয়া হয় না।

অবিলম্বে দাবি না মানলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা হুঁশিয়ারি দেন।

নদিয়া জেলা হাসপাতালে বিক্ষোভ

১০ অক্টোবর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন নদিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শক্তিনগরে জেলা হাসপাতাল সুপারের কাছে সমস্ত শূন্যপদে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের স্বচ্ছতা আনা, রোগী-ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা, আউটডোরে নির্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসকদের হাজির হওয়া, ইন্ডোরে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে রোগী পরিদর্শন, নাক-কান-গলা-দাঁত এবং চক্ষু বিভাগকে আলাদা করা, স্থায়ী ওয়ার্ড মাস্টার নিয়োগ সহ ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নদিয়া জেলা সম্পাদক ডাঃ সত্যজিৎ রায়, লক্ষ্মণ শর্মা, অঞ্জন মুখার্জী প্রমুখ। দাবি পূরণে ব্যবস্থা না নিলে সুপার অফিস ঘেরাও করা হবে বলে জানান তাঁরা।

জঙ্গিপুর এসডিও-কে ডেপুটেশন

ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ব্যবস্থা, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ, পুজোর আগেই সমস্ত ভাঙা রাস্তা সংস্কার, জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়ানো, পরিকাঠামোর উন্নতি ও দালাল চক্র বন্ধ, মোটরভ্যান, টোটো চলাচলে পুলিশের জলুম বন্ধ সহ ১৬ দফা দাবিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর এসডিও-র কাছে ১২ অক্টোবর বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

রঘুনাথগঞ্জ শহরে মিছিল এবং এসডিও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভার পরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মির্জা নাসিরউদ্দিন সহ ৩ জনের প্রতিনিধিদল। সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন এসডিও।

শিয়ালদহ ডিআরএম-এর কাছে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের দাবি পেশ

শিয়ালদহ ডি আর এম এর কাছে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে ২০ অক্টোবর ডিভিশনের কয়েকটি স্টেশনের কতগুলো জরুরি সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মঞ্চের কনভেনর প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ডিআরএম-এর হয়ে স্মারকলিপি গ্রহণ ও বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করেন এডিআরএম শিয়ালদহ মিঃ ভি কে সিং।

জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনের বেহাল হয়ে পড়া অ্যাপ্রোচ রোড ও ড্রেন সংস্কার, দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাউন্টার খোলা, ফুট ওভারব্রিজ মেরামত করা, বালিগঞ্জ স্টেশনে এসকালেটর চালু করা এবং ফুট ওভারব্রিজ চওড়া করা, আন্ডারপাস তৈরি করা, শিয়ালদা মেন স্টেশনে এক নম্বর গেট অবিলম্বে খুলে দেওয়া, ব্যারাকপুর স্টেশনের মাঝখানের ফুট ওভারব্রিজের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা ও তারামা এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়া, শ্যামনগর স্টেশনে শেড তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তে ফুট ওভারব্রিজ বানানো, ভগবানগোলা স্টেশনে ধনধান্য এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়া, আন্ডারপাস উপযুক্ত ভাবে তৈরি করা যাতে সবজি ও ফসলবাহী গাড়ি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে ও আন্ডারপাসে জল না জমে তা দেখা, স্টেশনে প্যাসেঞ্জার শেড তৈরি করা, টিকিট কাউন্টার বাড়ানো ও ভেন্ডিং মেশিন চালু করা, পানীয় জল, স্যানিটেশন ও ওয়েটিং হলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা— এগুলি আলোচনায় তুলে ধরা হয়।

এডিআরএম দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন ও ফান্ড প্রাপ্তির নিরিখে কাজগুলি সম্পন্ন হবে বলে আশ্বাস দেন। এই আর্থিক বছরের মধ্যেই শিয়ালদা স্টেশনের মেন গেট খুলে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দলে পূর্বতন সাংসদের সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ জানা, আজমল হক ও বটকৃষ্ণ রায়।

দূষণহীন ও কম খরচের ট্রাম ব্যবস্থা রক্ষার দাবিতে

গণস্বাক্ষর সহ মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

দূষণহীন ও কম খরচের ঐতিহ্যপূর্ণ ট্রাম ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার যে চেষ্টা চালাচ্ছে বর্তমান সরকার তার বিরুদ্ধে কয়েক মাস ধরে কলকাতা জুড়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। সর্বত্রই ট্রাম রক্ষায় নাগরিকদের বিপুল সমর্থন লক্ষ করা যায়। সেই সব স্বাক্ষর ১২ অক্টোবর মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্দেশে পাঠানো হয়। প্রায় পাঁচশো মানুষের একটি মিছিল ওই দিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছয়। সেখানে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিছু দিন আগেই দলের পক্ষ থেকে পরিবহণ দপ্তরের এমডি, পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট ট্রাম লাইনের উপর পিচ ঢেলে দেওয়া এবং ট্রামের সম্পত্তি হস্তান্তর করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী বলেন, ট্রাম অত্যন্ত পরিবেশবান্ধব এবং কম খরচের একটি যান। সরকার ট্রাম তুলে দেওয়ার পক্ষে যানজটের যে অজুহাত তুলছে তা একেবারেই ঠিক নয়। যানজট যা হয় তার কারণ রাস্তার দু'পাশের বেআইনি পার্কিং এবং সরকারের ভুল ট্রাফিক নীতি। জনগণের মত মেনে নিয়ে সরকার যদি কলকাতা থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে তবে আন্দোলন আরও জোরদার করে গড়ে তোলা হবে।

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ও শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক এলাকায় বর্ষার জমা জল দ্রুত বের করা ও সোয়াদিঘি খাল সংস্কারের দাবিতে ১২ অক্টোবর জলবন্দি এলাকার পাঁচ শতাধিক মানুষ ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিডিও অবরোধস্থলে উপস্থিত হয়ে সেচ দপ্তরের এসডিও-কে নিয়ে বৈঠক করে দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে গণদাবীতে তাঁর বিভিন্ন রচনার অংশ আমরা প্রকাশ করছি। এবার 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এর অংশবিশেষ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী, কারাগার ইত্যাদি

এঙ্গেলস বলেছেন, '... পুরাতন গোষ্ঠী (উপজাতীয় বা ক্ল্যান) সংগঠন থেকে রাষ্ট্রের প্রথম পার্থক্য এই যে রাষ্ট্র তার প্রজাদের অঞ্চলের ভিত্তিতে ভাগ করে ...'।

আমাদের কাছে এই রকম বিভাগটা 'স্বাভাবিক' লাগে, কিন্তু তার জন্য পুরনো গোষ্ঠী বা উপজাতীয় সামাজিক সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পরই এই ধরনের বিভাগ সম্ভব হয়েছিল।

'... এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল একটি রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা, যা সশস্ত্র শক্তি হিসাবে স্বয়ং-সংগঠিত জনসাধারণের সঙ্গে আর একাত্ম নয়। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার সময় থেকে জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে, ফলে এই বিশেষ রাষ্ট্রীয় শক্তির দরকার হয়। ... প্রতিটি রাষ্ট্রেই এই সশস্ত্র শক্তিটা বর্তমান। এই রাষ্ট্রীয় শক্তিটা শুধু সশস্ত্র বাহিনী দিয়েই নয়, কারাগার এবং সমস্ত রকম দমনমূলক প্রতিষ্ঠান সহ আরও নানা প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে ওঠে, যা গোষ্ঠীভিত্তিক (ক্ল্যান) সমাজব্যবস্থায় ছিল অজ্ঞাত...'।

এঙ্গেলস প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন রাষ্ট্র নামে অভিহিত সেই 'শক্তি'র ধারণাটাকে, যা সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েও সমাজের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপিত করে এবং ক্রমাগত সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। এই শক্তিটা প্রধানত কী দিয়ে তৈরি? এই শক্তি গঠিত হয় সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী দ্বারা, যাদের হাতে আছে কারাগার ইত্যাদি।

সশস্ত্র লোকেদের বিশেষ বাহিনীকে আলাদা বলার অধিকার আমাদের আছে, কারণ এই দমনমূলক শক্তিটা সমস্ত রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য যা সশস্ত্র জনগণ, তাদের 'স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠনের' সঙ্গে একেবারেই মেলে না।

সমস্ত মহান বিপ্লবী চিন্তানায়কের মতো এঙ্গেলস শ্রেণি সচেতন শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন ঠিক সেই দমনমূলক বিষয়টার দিকে, যেটা স্তরে স্তরে জমাট বাঁধা সংস্কারের কল্যাণে পূত-পবিত্র মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ বর্তমান পণ্ডিতমূর্খেরা এটাকে মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য বলেই মনে করে না, তাদের কাছে এটা নিতান্ত মামুলি একটা বিষয়। স্থায়ী সৈন্যদল আর পুলিশই হল রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার। এছাড়া অন্য রকম হতে পারে কি?

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের বেশির ভাগ লোক যারা একটাও বৃহৎ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যায়নি বা কাছ থেকে বিপ্লবকে দেখেনি, তাদের উদ্দেশে এঙ্গেলস এ কথা লিখেছিলেন যে, এদের অধিকাংশের দৃষ্টিকোণ এমন না হয়ে পারে না। 'জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' বলতে কী বোঝায়, তা তারা বুঝতেই পারে না। সমাজের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত, ক্রমাগত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকা সশস্ত্র লোকেদের বিশেষ বাহিনীর (পুলিশ, স্থায়ী সৈন্যদল) প্রয়োজন হল কেন, এ প্রশ্নের জবাবে পশ্চিম ইউরোপীয় ও রুশ কূপমণ্ডুকেরা স্পেনসার কিংবা মিখাইলভস্কির কাছ থেকে ধার করা দুটো বুলি আউড়ে, সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধি, পেশাগত বিভিন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা যুক্তি দিতে থাকে।

এই নজিরগুলোকে 'বিজ্ঞানসম্মত' মনে হতে পারে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল যে বিষয়টি— অর্থাৎ সমাজ এমন পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যে তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা অসম্ভব, এই সত্যটি চাপা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা সহজ হয়।

সমাজের এই শ্রেণি বিভাজন না ঘটলে, 'জনগণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' থাকা সম্ভব হত। তা অবশ্যই লাঠিধারী আদি বানর পাল, অথবা আদিম মানুষ, অথবা গোষ্ঠীগত (ক্ল্যান) সমাজে মানুষের সংগঠন অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রের উন্নত প্রযুক্তির দিক থেকে অন্য রকম হত, কিন্তু এই সংগঠনটা গড়ে ওঠা সম্ভব হত।

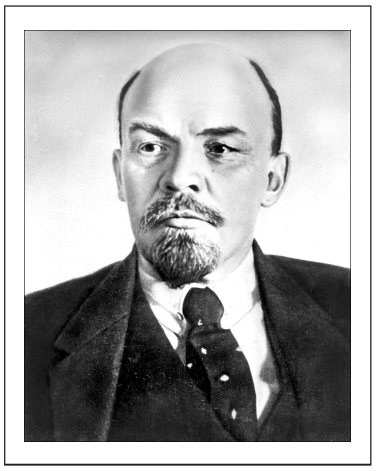

কিন্তু তা সম্ভব হল না, কারণ সভ্য সমাজ পরস্পরবিরোধী শ্রেণিতে, আরও বড় বিষয় হল, আপস-মীমাংসা অসম্ভব, এমন দুই শত্রু-শ্রেণিতে বিভক্ত। তাদের 'স্বয়ংক্রিয়' সশস্ত্রকরণের পরিণাম হত, এই শ্রেণিগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম। সে জন্য দেখা দিল রাষ্ট্র, গড়ে উঠল আলাদা একটা শক্তি, একটা বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী। প্রতিটি বিপ্লব রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় শ্রেণি সংগ্রামের বাস্তবতাকে। দেখায়, কী ভাবে শাসক শ্রেণি তাদের সেবক বিশেষ সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। একই সাথে দেখায়, কী ভাবে নিপীড়িত শ্রেণিও গড়ে তোলার চেষ্টা চালায় সেই ধরনের নতুন সংগঠন, যা শোষকদের পরিবর্তে শোষিতদের স্বার্থ রক্ষা করছে।

সশস্ত্র লোকের 'বিশেষ' বাহিনী এবং 'জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন'— এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী সে প্রশ্ন প্রত্যেক বড় বড় বিপ্লবের সময়েই দেখা দেয়, দেখা দেয় ব্যবহারিকভাবে, সুস্পষ্টরূপে ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে। উপরের আলোচনায় এঙ্গেলস তত্ত্বের দিক থেকে সেই প্রশ্নই তুলেছেন। ইউরোপীয় ও রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে এর মূর্ত নিদর্শন কী ভাবে ফুটে উঠেছে, আমরা তা দেখতে পাব।

এখন ফেরা যাক এঙ্গেলসের বক্তব্যে।

তিনি দেখিয়েছেন, কখনও কখনও, যেমন উত্তর আমেরিকার কোথাও কোথাও এই রাষ্ট্রশক্তিটি দুর্বল (পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে বিরল একটি ব্যতিক্রমের কথা এঙ্গেলসের মনে হয়েছে এবং তিনি সাম্রাজ্যবাদের আগের যুগের উত্তর আমেরিকায় এমন অনেক জায়গার কথা বলেছেন যেখানে স্বাধীন ঔপনিবেশিকদেরই প্রাধান্য ছিল)। কিন্তু সাধারণভাবে বললে, তা অধিকতর শক্তিশালী হয় ঃ

'... রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণি-বিরোধ যে পরিমাণে তীব্র হয় এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আয়তনে এবং জনসংখ্যায় যত বাড়তে থাকে রাষ্ট্রের শক্তিও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে। শুধু বর্তমান ইউরোপের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, শ্রেণি-সংগ্রাম ও রাজ্য জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে এমন উচ্চতায় বাড়িয়ে তুলেছে যে, তা গোটা সমাজ, এমনকি খোদ রাষ্ট্রটাকে পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারে এমন বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে...।'

এটা লেখা হয়েছিল গত শতকের ৯০-এর দশক শুরুর মধ্যেই। এঙ্গেলসের শেষ ভূমিকার তারিখ ১৬ জুন ১৮৯১। রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন বলতে বোঝায়, ব্যবসায়ী সংঘের (ট্রাস্ট) পূর্ণ আধিপত্য, বড় বড় ব্যাঙ্কের সর্বব্যাপক দাপট, বিপুল পরিসরে ঔপনিবেশিক কর্মনীতি ইত্যাদি— যেগুলি সবেমাত্র শুরু হয়েছে ফ্রান্সে। উত্তর আমেরিকা ও জার্মানিতে তা তখন আরও দুর্বল। তারপর থেকে 'দেশ জয়ের প্রতিযোগিতা' বিপুল আকারে বেড়েছে। বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় দেখা গেল এই সব 'প্রতিদ্বন্দ্বী দখলদারদের' মধ্যে, অর্থাৎ বড় বড় আগ্রাসী শক্তিদের মধ্যে পৃথিবীটা পুরোপুরি বন্টিত হয়ে গেছে। তারপর সামরিক ও নৌবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা বেড়ে উঠেছে অবিশ্বাস্য মাত্রায়। দুনিয়ার ওপর কে প্রভুত্ব করবে— ব্রিটেন না জার্মানি, তা নিয়ে এবং লুঠের বাঁটোয়ারা নিয়ে ১৯১৪-১৯১৭ সালের যুদ্ধে চরম লোভী ও হিংস্র রাষ্ট্রশক্তি গিলে খেয়েছে সমাজের সমস্ত শক্তিকে। যা সমাজকে নিয়ে গেছে পরিপূর্ণ বিপর্যয়ের কাছাকাছি।

১৮৯১ সালেই বৃহৎ শক্তিগুলির বিদেশনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে এঙ্গেলস 'রাজ্যজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার' উল্লেখ করেছিলেন। আর ১৯১৪-১৯১৭ সালে যখন ঠিক এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাটাই বহুগুণ তীব্র হয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্ম দিল, সমাজতন্ত্রের ভেকধারী উগ্র জাতীয়তাবাদী (সোস্যাল শোভিনিস্ট) শয়তানরা তখন 'পিতৃভূমি রক্ষা', 'প্রজাতন্ত্র ও বিপ্লব রক্ষা' ইত্যাদি বুলি আউড়ে 'নিজ নিজ' দেশের বুর্জোয়াদের লুঠেরা স্বার্থকে আড়াল করতে থাকল!

(৩)

রাষ্ট্র হল নিপীড়িত শ্রেণিকে শোষণের হাতিয়ার

সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই বিশেষ নিপীড়ন যন্ত্রের ভরণপোষণের জন্য দরকার কর আদায় ও রাষ্ট্রীয় ঋণ।

এঙ্গেলস লিখেছেন, '... রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর আদায়ের অধিকার থাকায় সরকারি অফিসারেরা সমাজের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে সমাজেরই অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। গোষ্ঠীভিত্তিক (ক্ল্যান) সমাজের কার্যকর্তারা যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা পেত, তা অর্জন করতে পারা যদি বা বর্তমান শাসকদের পক্ষে সম্ভব হত, সেটাও আর তাদের কাছে যথেষ্ট হত না।' ... 'রাজপুরুষরা পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, এই মর্মে বিশেষ আইন তৈরি করা হয়েছে। 'সবচেয়ে নগণ্য পুলিশ কর্মচারীটি'-ও গোষ্ঠী সমাজের প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশি 'ক্ষমতাশালী', কিন্তু গোষ্ঠীপতিরা সমাজের কাছ থেকে যে 'অবারিত শ্রদ্ধা' পেত তা সভ্য রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কেরও ঈর্ষার বস্তু।

রাষ্ট্রশক্তির যন্ত্র হিসেবে রাজপুরুষদের বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগের কথা এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে। মূল কথাটা বলা হয়েছে এই ভাবে যে, যার জোরে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, তা কী? ১৮৭১-এ প্যারিস কমিউন কী ভাবে হাতে কলমে এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটার সমাধান করেছিল এবং ১৯১২-তে কাউটস্কি কী ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান থেকে প্রশ্নটাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন, সেটা আমরা দেখব।

'যেহেতু শ্রেণি বিরোধকে সংযত রাখার প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব, কিন্তু আবার যেহেতু শ্রেণি-সংঘাত থেকেই এর উৎপত্তি, তাই রাষ্ট্র সর্বদাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে পরাক্রান্ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণির রাষ্ট্র। আবার রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে এই শ্রেণিই রাজনৈতিকভাবেও প্রভুত্বকারী শ্রেণি হয়ে ওঠে এবং এই ভাবেই তারা নিপীড়িত শ্রেণিকে দমন ও শোষণের নতুন নতুন উপায় হস্তগত করে...'। প্রাচীন ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ছিল ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের শোষণের যন্ত্র। একই ভাবে 'আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র'ও হল পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে কখনও কখনও এমন পর্ব দেখা যায় যখন দ্বন্দ্বে লিপ্ত শ্রেণিগুলির শক্তি এমন একটা ভারসাম্যে পৌঁছয় যখন রাষ্ট্রশক্তি সাময়িকভাবে আপাত মধ্যস্থতা রক্ষার কাজ করে, যাতে উভয়ের সম্পর্কেই রাষ্ট্র খানিকটা পরিমাণ স্বাধীন ভূমিকা নেয়...'। সতেরো ও আঠারো শতকের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, ফ্রান্সে প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বোনাপার্টতন্ত্র, জার্মানিতে বিসমার্কের সময়টাতে ঠিক যেমন ছিল।

এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে দমন শুরু করার পর এই রকমই হয়েছিল প্রজাতান্ত্রিক রাশিয়ায় কেরেনস্কি সরকারের পরিস্থিতি। এটা এমন এক মুহূর্ত যখন পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বের কল্যাণে সোভিয়েতগুলি হয়ে পড়েছে শক্তিহীন, অথচ সোজাসুজি তাদের উৎখাত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা বুর্জোয়াদের তখনও নেই।

এঙ্গেলস লিখেছেন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'ধন সম্পদের শক্তি পরোক্ষে, কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরীরূপে ক্ষমতা প্রয়োগ করে', প্রথমত, 'রাজপুরুষদের সোজাসুজি কিনে নিয়ে' (যেমন আমেরিকাতে), দ্বিতীয়ত, 'শেয়ার বাজারের সঙ্গে সরকারের জোট' মারফত (যেমন

আটের পাতায় দেখুন

ছিন্নভিন্ন প্যালেস্টাইন

তিনের পাতার পর

ও মিশরে হামলা চালিয়ে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর, সিরিয়ার গোলান হাইট্‌স ও গাজা সহ মিশরের সিনাই উপদ্বীপ দখল করে নেয় ইজরায়েল। ১৯৭৩-এর যুদ্ধে আবার মিশর পর্যুদস্ত করে ইজরায়েলকে। ১৯৭৮-এর শান্তিচুক্তিতে মিশর ফেরত পায় সিনাই উপদ্বীপ। কিন্তু জেরুজালেম সহ জর্ডনের পশ্চিম তীর ও গাজা ইজরায়েল নিজের কব্জায় রাখতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, ইজরায়েল ১৯৮০ সালে জেরুজালেমকে নিজেদের রাজধানী ঘোষণা করে। যদিও বিশ্বের কোনও দেশই সেই সময় ইজরায়েলের এই অন্যায় দখলদারিকে স্বীকৃতি দেয়নি।

ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনের মানুষের প্রতিরোধ সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠেছে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)। কিন্তু প্যালেস্টাইনে এমনকি তাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা বিক্ষোভ আন্দোলনগুলির উপরেও নির্মম দমন-পীড়ন চালাতে থাকে ইজরায়েলের সেনাশাসকরা। প্যালেস্টিনীয় আরবদের উপর চালাতে থাকে নির্বিচার দাদাগিরি। স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টিনীয় আরবরাও ইজরায়েলের প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর উপর আঘাত হানার রাস্তা খোঁজে।

অসলো চুক্তি সরাসরি লংঘন করেছে ইজরায়েল

প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে পিএলও এবং ইজরায়েলের একটি চুক্তি হয়, যেটি অসলো চুক্তি নামে পরিচিত। সেই চুক্তিতে প্যালেস্টাইনের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তথা প্যালেস্টাইনে স্বশাসিত সরকার গড়ার কথা স্বীকৃত হয়। পিএলও ইজরায়েলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ঠিক হয়, প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর পূর্ব জেরুজালেমকে তার রাজধানী বলে মেনে নেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক ভাবেই স্বীকৃত হয় যে এবার প্যালেস্টাইন জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।

ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। পিএলও-র নেতৃত্বে তথাকথিত প্যালেস্টাইন অথরিটি প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারেনি ইজরায়েলের অন্যায় আধিপত্যবাদী আচরণের কারণে। প্যালেস্টাইনের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে দখল করে রাখা পূর্ব অংশ সহ গোটা জেরুজালেমেই ইজরায়েলে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। অসলো চুক্তিকে দু পায়ে মাড়িয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করে সেখানে দেশের আইনসভা, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ইত্যাদি তৈরি করেছে ইজরায়েল। ২০১৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও আন্তর্জাতিক মতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী বলে মান্যতা দেন, যা প্যালেস্টাইনের মানুষ মেনে নিতে পারেননি।

প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠিত হলে উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের উদ্বাস্তু শিবির থেকে স্বভূমিতে ফেরার দাবি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে ইজরায়েল। শুধু তাই নয়, ইজরায়েল ঘোষণা করেছে, প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তাকে সার্বভৌম ক্ষমতা তারা দেবে না। প্যালেস্টাইন নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারবে না, তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে ইজরায়েলের হাতে। শুধু এইসব অন্যায় আব্দারই নয়, বিশ্ব জনমতকে অগ্রাহ্য করে বছরের পর বছর ধরে ইজরায়েল লাগাতার হামলা চালিয়ে চলেছে প্যালেস্তাইনের সাধারণ নাগরিকদের উপরে। এই অবস্থায় স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বিশ বাঁও জলেই থেকে যায়। প্যালেস্টাইনের সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, পণ্য ও মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে ইজরায়েলের সেনা।

প্রথম ও দ্বিতীয় 'ইন্তিফাদা'

ইজরায়েলের নিষ্ঠুর গা-জোয়ারির বিরুদ্ধে ১৯৮৭ সালে পিএলও-র নেতৃত্বে শুরু হয় 'ইন্তিফাদা' বা প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলনে প্যালেস্টাইনের আরব অধিবাসীরা একের পর এক গণবিক্ষোভ গড়ে তুলতে থাকে। পাশাপাশি চলতে থাকে ইজরায়েলের পুলিশ ও সেনার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির পর পিএলও প্যালেস্টাইনের প্রশাসন চালানোয় মন দিলে নানা কারণে ধীরে ধীরে এই সংগঠনটির মধ্যে আপসমুখি মনোভাব দেখা দেয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য জানকবুল মানসিকতার বদলে নেতাদের গ্রাস করে নিতে থাকে নানা দুর্নীতি। এই অবস্থায় সেখানকার স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ২০০০ সাল নাগাদ শুরু হল দ্বিতীয় ইন্তিফাদা নামে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন। এবারের আন্দোলনের নেতৃত্ব পিএলও-র হাত থেকে সরে নানা জঙ্গি সংগঠনের হাতে চলে যায়। স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টিনীয় যুবকদের বুকের রক্তে ভেসে যেতে থাকে দেশ।

বর্তমান পরিস্থিতি

এই অবস্থায় ২০০৫ সালে হামাস ও তার সহযোগী কয়েকটি সংগঠন গাজার প্রশাসন পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। ইতিমধ্যে ধনী দেশ ইজরায়েল শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। তার মাথায় রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্যাঙাতদের আশীর্বাদের হাত। ফলে দিনে দিনে প্যালেস্টাইনকে সে কোণঠাসা করে ফেলতে থাকে। লাগাতার চালাতে থাকে নির্বিচার রক্তক্ষয়ী হামলা। শিশু-নারী সহ সাধারণ প্যালেস্টিনীয়দের প্রাণহানি প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে ওঠে। এমনকি প্যালেস্টিনীয় উদ্বাস্তু শিবিরও ইজরায়েলের সেই নির্মম হামলা থেকে রক্ষা পায়নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত 'দুই রাষ্ট্র সমাধান' তুড়ি মেরে উড়িয়ে তারা বলতে শুরু করে, একটাই রাষ্ট্র থাকবে যার নাম ইজরায়েল। প্যালেস্টাইন নামে কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্বই রাখবে না তারা। ইহুদিরা বাস করবে প্যালেস্টাইনের সর্বত্র। দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে সংখ্যালঘু আরব বাসিন্দারা তাদের সেবা করবে। কোনও রকম রাজনৈতিক অস্তিত্বই থাকবে না প্যালেস্টিনীয় আরবদের। বাস্তবিকই, প্যালেস্টাইনের মানচিত্রের সালওয়াড়ি বিবর্তন লক্ষ করলেই দেখা যাবে, ইজরায়েল ধীরে ধীরে নিজের দখলদারি এমন ভাবে বিস্তার করেছে যে, কার্যত প্রায় গোটা প্যালেস্টাইনই আজ তার কব্জায়।

এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত বিপন্ন প্যালেস্টিনীয়দের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মরিয়া হামাস গত ৭ অক্টোবর আচমকা হামলা চালায় ইজরায়েলের উপর। এই আক্রমণকে দীর্ঘদিন ধরে অবমানিত, অত্যাচারিত, নিজস্ব বাসভূমি থেকে অন্যায় ভাবে বিতাড়িত স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টিনীয়দের বেপরোয়া প্রতিক্রিয়া হিসাবে বুঝতে হবে। একেই অজুহাত করে আত্মরক্ষার নামে তার প্রতিশোধ নিতে ইজরায়েল যা করছে, তাকে নৃশংস গণহত্যা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নৃশংস আক্রমণ ও গাজাকে সবদিক দিয়ে অবরুদ্ধ করার পাশাপাশি ইজরায়েল সেখানকার আন্তর্জাল সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় গাজার বর্তমান পরিস্থিতি কতখানি ভয়ঙ্কর, সেই খবরটুকুও ঠিক মতো বাইরে আসতে পারছে না। সব মিলিয়ে বর্তমানে প্যালেস্টাইনের অসহায় সাধারণ মানুষের জীবনকে জীবন্ত নরকে পরিণত করেছে এই উগ্র ইহুদিবাদী রাষ্ট্র।

সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা

আগেই বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী লুঠের স্বার্থে পশ্চিম এশিয়ায় নিজের এজেন্ট হিসাবে প্রথম থেকেই ইজরায়েল রাষ্ট্রকে সব রকম ভাবে মদত দিয়ে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবারের সংঘাতেও যুদ্ধজাহাজের বহর সহ অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার নিয়ে ইজরায়েলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। এই সংঘর্ষে তার লাভ দু'দিক দিয়ে। একদিকে ইজরায়েলের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ায় নিজের আধিপত্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা, অন্যদিকে অস্ত্র বেচে মন্দায় তলিয়ে যেতে থাকা অর্থনীতির হাল খানিকটা হলেও ফেরানোর সুযোগ তৈরি হওয়া। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্যাঙাৎ ইউরোপের অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও রক্তক্ষয়ী এই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ বন্ধ করতে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট নয়। ব্রিটেন তার নৌবহর নিয়ে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

একই ভাবে, প্যালেস্টাইনের পক্ষে দাঁড়াবার বদলে, গোটা দেশের জনমতকে অগ্রাহ্য করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিজেপির নরেন্দ্র মোদিও এই অসম সংঘর্ষে সরাসরি ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এতে মার্কিন-কর্তাদের সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লুটের স্বার্থটিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা চালালেন তিনি। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার লড়াইয়ের পাশে থাকার ভারতের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে দেশের শাসক শ্রেণি এখন ধনী সাম্রাজ্যবাদী দেশ ইজরায়েলের সঙ্গে ব্যবসায়িক স্বার্থে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে উদগ্রীব। শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি হয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম ইজরায়েল সফর করেছেন নরেন্দ্র মোদি।

অস্ত্র কেনাবেচায় ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের এখন বিপুল টাকার লেনদেন চলে। সম্প্রতি ইজরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ হাইফা বন্দর কিনে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ একচেটিয়া পুঁজিপতি আদানি সাহেব। ফলে উগ্র ইহুদিবাদী ফ্যাসিস্ট ইজরায়েলের সমর্থনে এখন সোচ্চার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এই নির্লজ্জতা এতটাই সীমা ছাড়িয়েছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় আনা শান্তিচুক্তি তথা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানে পর্যন্ত বিরত থেকেছে ভারত।

ইজরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার গোটা বিশ্ব

সাম্রাজ্যবাদী লুঠের স্বার্থে ইজরায়েল ও তার সাম্রাজ্যবাদী দোস্তদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে গোটা দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় যুদ্ধবিরোধী সাধারণ মানুষ। প্যালেস্টাইনের প্রতিবেশী আরব দেশগুলিতেই শুধু নয়, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি সহ ইউরোপের প্রতিটি দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকি খোদ ইজরায়েলেও উগ্র ইহুদিবাদীদের এই নির্মম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন খেটে-খাওয়া মানুষ।

মিছিলে মিছিলে স্লোগান উঠছে— 'ফ্যাসিস্ট ইজরায়েল প্যালেস্টাইন থেকে হাত ওঠাও'। ভারতের সাধারণ মানুষও সামিল হয়েছে এই প্রতিবাদে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে এই একমেরু বিশ্বে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যান্য হামলাগুলির মতোই প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের এই হানাদারি গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশে দেশে শক্তিশালী যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে।

বাঁকুড়া ডিএম দপ্তরে কৃষকদের বিক্ষোভ

বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ, ছাতনা, শালতোড়া, গঙ্গাজলঘাটি সহ সাতটি ব্লককে খরা ঘোষণা, খরা প্রতিরোধে জেলায় মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ ও দ্রুত রূপায়ণ, চাষিদের বিঘা প্রতি ১২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ, অবিলম্বে গ্রামীণ মজুরদের জন্য কাজ চালু, দ্বিগুণ পরিমাণ রেশন সরবরাহ, রাসায়নিক সারের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও কালোবাজারি বন্ধ করে এমআরপি-তে সরবরাহ, প্রতি অঞ্চলে শিবির করে সহায়ক মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয়, প্রতি অঞ্চলে অস্থায়ী ক্যাম্প করে পাট্টা প্রাপ্তদের জমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ, নদীর পাড় বাঁধাই, সমস্ত গরিব চাষিকে কৃষি ঋণ দেওয়া ও সাম্প্রতিক অসময়ের টানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়া ও ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণ সহ ১৮ দফা দাবিতে ১১ অক্টোবর এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। তার আগে সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। বক্তব্য রাখেন এআইকেকেএমএস-এর জেলা সভাপতি দিলীপ কুণ্ডু। ডি এম দপ্তরে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সহসভাপতি বিদ্যুৎ শীট ও জেলা সম্পাদক তারাশঙ্কর গোপ।

এডিএম (জেনারেল) প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনায় সবকটি দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ইটাহারে কৃষকদের আন্দোলনের চাপে ন্যায্যমূল্যে সার দিতে বাধ্য হল ডিলার

রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো উত্তর দিনাজপুরের চাষিদেরও নির্ধারিত দামের থেকে অনেক বেশি দিয়েই সার কিনতে হয়। নির্ধারিত মূল্যে যে সার পাওয়া যেতে পারে চাষিরা প্রায় তা ভুলতে বসেছে। এই অবস্থায় ২৪

অক্টোবর উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকে গুলন্দর ও দুর্গাপুর অঞ্চলের দুটি সভায় যখন এআইকেকেএমএস নেতারা যখন বললেন, ন্যায্য মূল্যে সার পাওয়াটা চাষিদের অধিকার এবং তা সম্ভর যদি চাষিরা সংগঠিত ভাবে এটা দাবি করেন। স্বাভাবিক ভাবেই নেতৃত্বের এই বক্তব্যে চাষিরা তৎক্ষণাৎ রাজি হন এবং পরদিন সারের জন্য ডিলারের কাছে উপস্থিত হন। কিন্তু কালোবাজারিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া দোকানদার নানা অজুহাতে কৃষকদের ফিরিয়ে দেন, বলেন পরদিন সকালে আসতে।

২৬ অক্টোবর সকাল দশটার মধ্যে কৃষকরা উপস্থিত হয়ে দেখেন, সেই ডিলার তার নিজের কিছু লোকজন জড়ো করেছে, সঙ্গে রয়েছে দু'গাড়ি পুলিশ। ষড়যন্ত্র বুঝতে এআইকেকেএমএস নেতাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু ডিলারের আচরণে কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ততক্ষণে কৃষকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় হাজারের কাছাকাছি। কৃষক নেতারা সকলকে নিয়ে একটি সভা করেন এবং ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের উত্তেজিত হতে না করেন। এরপর ডিলার এবং পুলিশের সঙ্গে কৃষক নেতাদের আলোচনায় ডিলার এমআরপি রেটে সার দিতে রাজি হন। সংগঠিত আন্দোলনের এই জয়ে কৃষকরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। নেতৃত্ব দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেক চাষিকে সার বিক্রি করতে ডিলারকে বাধ্য করেন। চাষিরা এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার ঘোষণা করেন। কৃষকরা উপস্থিত নেতাকর্মীদের বারবার অনুরোধ করেন তাদের গ্রামে গ্রামে মিটিং করার জন্য। দূরের গ্রাম থেকেও চাষিরা নেতাদের ফোন করতে থাকেন তাদের এলাকায় মিটিং করার জন্য এবং গ্রামে গ্রামে ন্যায্য মূল্যে সারের দাবি সহ চাষিদের অন্য দাবিগুলি নিয়ে মিটিং চলছে। চলছে আরও বড় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তপন কুমার দাস, হবিবুর রহমান, মহিদুর রহমান, সনাতন দত্ত, জাকির হোসেন প্রমুখ।

তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে এসইউসিআই(সি)-র প্রার্থী তালিকা

নভেম্বরে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা—এই তিনটি রাজ্যে এসইউসিআই(সি) সংগ্রামী বামপন্থাকে হাতিয়ার করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে দল ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে কেবল পুঁজিপতিদের সেবক বদল হয় বা সেবকের নবীকরণ ঘটে। এইসব নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে জনজীবনের মৌলিক সমস্যার কোনও সমাধান হবে না, প্রচারে সে সব তুলে ধরা হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে জনজীবনে পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের বোঝা ক্রমাগত বাড়ছে। এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ছাড়া সাধারণ মানুষের বাঁচার আর কোনও রাস্তাই খোলা নেই। নির্বাচনে সাধারণ মানুষের কাজ হবে গণআন্দোলনের যথার্থ শক্তিকে চিনে নেওয়া এবং তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা। এই বক্তব্য নিয়ে দলের কর্মী-সমর্থকরা মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন।

মধ্যপ্রদেশ

১) গোয়ালিয়র	কমরেড মিতালী শুক্লা
২) বামোরি	কমরেড শ্রীরাম সেন
৩) গুনা	কমরেড সীমা রাই
৪) অশোকনগর	কমরেড দেবেন্দ্র আহিরওয়াড়
৫) সাগর	কমরেড সোনা কুশওয়াহ প্যাটেল
৬) গোবিন্দপুরা	কমরেড বিনোদ লোগারিয়া
৭) দেওয়াস	কমরেড রাজুল শ্রীবাস্তব
৮) ইন্দোর-২	কমরেড প্রমোদ নামদেব

ছত্তিশগড়

১) ধামতরি	কমরেড গীতা সারথী
২) দুর্গ শহর	কমরেড আত্মারাম সাহু

তেলেঙ্গানা

১) খৈরাতাবাদ	কমরেড কুরাকুলা জ্যোতি
২) পাটনচেরু	কমরেড পালাদি দেবাইয়া
৩) কালভারথী	কমরেড পালাদি কিরণ কুমার

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

ছয়ের পাতার পর

ফ্রান্স ও আমেরিকাতে)।

বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যাঙ্কের আধিপত্যের ফলে সব ধরনের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই ধন-সম্পদের সর্বময় শক্তিকে রক্ষা ও কার্যকরী করার উপরোক্ত দুটি পথ অসাধারণ কৌশলে 'বিকশিত' হয়েছে। যেমন, রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে, যাকে বলা যেতে পারে কোয়ালিশন সরকারে বুর্জোয়াদের সঙ্গে 'সমাজতন্ত্রী' সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের পরিণয় বন্ধনের মধুমাস, সেই সময়েই পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করা ও তাদের দস্যুবৃত্তি ও মিলিটারি কনট্রাক্ট মারফত রাজকোষ লুণ্ঠনে বাধা দেওয়ার জন্য সম্মিলিত মন্ত্রিসভা যে-সব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, শ্রী পালচিনস্কি সেই-সব প্রস্তাবের প্রত্যেকটিরই বিরোধিতা করেন। তারপর মন্ত্রিপরিষদ থেকে বিদায় নেবার পর তিনি (অবশ্যই একই রকম আর এক পালচিনস্কির জন্য স্থান ছেড়ে দিয়ে) পুঁজিপতিদের কাছ থেকে বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার রুবল বেতনের চাকরির 'পুরস্কার' পেলেন— এটাকে কী বলা যাবে? এটা কি সোজাসুজি ঘুষ, নাকি পরোক্ষ ঘুষ? সরকারের সঙ্গে সিন্ডিকেটদের জোট, নাকি 'শুধুই' বন্ধুত্ব? কী ভূমিকা নিচ্ছেন চের্নোভ, সেরেতেলি, আভক্সেন্তিয়েভ এবং স্কবেলেভরা? কোটিপতি রাজকোষ-লুঠেরাদের সঙ্গে তাদের যোগ 'প্রত্যক্ষ', নাকি তাঁরা কেবল 'পরোক্ষ' সহযোগী?

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'সম্পদের' সর্বময় ক্ষমতা এই কারণে নিশ্চিত যে, রাজনৈতিক কাঠামোর কোনও ত্রুটি বা পুঁজিবাদের রাজনৈতিক খোলসটা কত নিকৃষ্ট তার ওপর এই ক্ষমতা নির্ভর করে না। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল পুঁজিবাদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খোলস। তাই ক্ষমতা কায়েম করতে পুঁজি (পালচিনস্কি, চের্নোভ, সেরেতেলি কোং-দের মতো লোকেদের মারফত) এই সর্বোৎকৃষ্ট খোলসটাকে দখল করেছে। এই দখল এতটাই পাকা, এতটাই সুনিশ্চিত যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা পার্টি, এ-সব কোনও কিছুর বদলের দ্বারাই সে ক্ষমতা নড়ানো যায় না।

আরও বলা দরকার যে, এঙ্গেলস সুনির্দিষ্টভাবে সর্বজনীন ভোটাধিকারকেও বলেছেন বুর্জোয়া প্রভুত্বের হাতিয়ার। স্পষ্টতই জার্মান সোসাল ডেমোক্রেসির দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা মনে রেখে তিনি বলেছেন, সর্বজনীন ভোটাধিকার হল— "শ্রমিক শ্রেণি কতটা পরিণত হয়েছে তার সূচক। আধুনিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার এ ছাড়া আর বেশি কিছু হতে পারে না, কখনও হবেও না।"

আমাদের সোসালিস্ট রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের মতো পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা এবং তাদের যমজ ভাই পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত সোস্যাল শোভিনিস্ট ও সুবিধাবাদীরা সর্বজনীন ভোটাধিকার থেকে ঠিক ওই 'বেশি কিছুটার'ই আশা করে। 'বর্তমান রাষ্ট্রে' সর্বজনীন ভোটাধিকার বুঝি-বা সত্যিই অধিকাংশ মেহনতি জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ করতে ও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম, এই অলীক ধারণাটা তারা নিজেরা পোষণ করে ও জনগণের মনে ঢোকায়।

এখানে আমরা সেই ভ্রান্ত ধারণাটার উল্লেখটুকু করছি যে, এঙ্গেলসের অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট উক্তিকে 'সরকারি' (অর্থাৎ সুবিধাবাদী) সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলির প্রচার ও আন্দোলনে প্রতিপদেই বিকৃত করা হচ্ছে। এঙ্গেলস যে ধারণাটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করেছেন, তার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 'বর্তমান' রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের বক্তব্য সংক্রান্ত আমাদের পরবর্তী আলোচনায়।

এঙ্গেলস তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় পুস্তকটিতে নিজ দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে— '... রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শাশ্বত কালের নয়। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলেছে, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রক্ষমতার কোনও ধারণা তাদের ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে এসে যখন সমাজ অবশ্যম্ভাবী রূপে শ্রেণিবিভক্ত হয়ে পড়ে, সেই বিভাজনের কারণে রাষ্ট্র এক অবশ্য প্রয়োজন হিসাবে উদ্ভূত হয়।

আমরা এখন উৎপাদন বিকাশের এমন একটা পর্যায়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি, যখন এই সব শ্রেণির অস্তিত্ব শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, তাদের অস্তিত্ব উৎপাদনের সামনে সোজাসুজি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতীতে শ্রেণির উদয় যেমন অনিবার্য ছিল, তেমনই অনিবার্য হবে তাদের বিলুপ্তি। শ্রেণি বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবেই লোপ পাবে রাষ্ট্র। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলে সমাজ সে দিন পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে পাঠাবে পুরাবস্তুর যাদুঘরে— চরকা ও ব্রোঞ্জ কুঠারের পাশে হবে তার যোগ্য স্থান।

বর্তমান সোসাল-ডেমোক্র্যাটদের প্রচার ও আন্দোলনমূলক সাহিত্যে এঙ্গেলসের এই কথাগুলো বড় একটা দেখা যায় না। যদিওবা কোথাও নজরে পড়ে, দেখা যায় দেবতার বিগ্রহের সামনে নতজানু হওয়ার মতো করে তারা এগুলি উদ্ধৃত করে। অর্থাৎ এঙ্গেলসের প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মান দেখানোর জন্যই তাদের তা করা। 'সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরাবস্তুর যাদুঘরে পাঠানোর' জন্য প্রয়োজনীয় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পরিধিটা যে কত গভীর ও ব্যাপক, তা নিয়ে ভাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তারা করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে এঙ্গেলস যা বুঝিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বোঝার চেষ্টাও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। (চলবে)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com